ভেলকুনমামা রিটার্নস

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : উজ্জয়িনী মিত্র

বইবন্ধু পাবলিশার্স

ভেলকুন-বৃত্তান্ত

ছোটোদের জন্য লিখতে শুরু করেছিলাম একটু দেরিতেই, ২০০৬ সালে। সেই প্রথম গল্পের মূল চরিত্র, লেখক ঘটিরাম গুপ্তকে নিয়ে পরবর্তীকালে আস্ত একটি সিরিজ লেখা হয়ে যায়। আবার ঠিক পরের বছর, অর্থাৎ ২০০৭-এই, উদ্ভট-আবিষ্কারক ভেলকুনমামা নামক চরিত্রটি তৈরি হয় পাক্ষিক 'আনন্দমেলা'র একটি গল্পে— ক্রমশ তিনিও সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন দ্রুতই। আমার এতদিনের লেখালিখিতে মোটের ওপর এই দুজনই সিরিজ-ক্যারেকটার হয়েছেন। ভেলকুনমামা শুধু গল্পে সীমাবদ্ধ নেই, দুটো উপন্যাসও তাঁকে নিয়ে লেখা হয়ে গেল।

ভেলকুনমামা চরিত্রটিতে, অনেকেই বলেন, প্রোফেসর শঙ্কুর হালকা ছায়া আছে, হয়তো রেবন্ত গোস্বামীর সৃষ্ট বিজ্ঞানী সাত্যকি সোম, কেউ বলেন ঈষৎ ঘনাদারও। তিনি একাধারে ইনভেন্টর এবং গুল-গল্পবিদ, তাঁর তিন খুদে বন্ধু-সহচর তাঁর অনেক আবিষ্কারের গল্পকেই অবিশ্বাসের চোখে দেখে। বস্তুতই তাঁর নিজের বাখান-করা অনেক অত্যাশ্চর্য যন্ত্র

বা অত্যদ্ভুত বস্তুর প্রকৃত কার্যকারিতা নিয়ে শেষ পর্যন্ত এমন সংশয় হয় যে, মামা সত্য বলছেন না গুল দিচ্ছেন (দিলেও তা কত শতাংশ) সেটা ঠাহর করা টিকলু-পল্টু-শতদলের পক্ষে তো বটেই, পাঠকদের পক্ষেও বেশ চাপের হয়ে ওঠে।

এহো বাহ্য। ভেলকুন সত্যি-আবিষ্কারক না মিথ্যে-আবিষ্কারক, তা এইসব কাহিনির আসল ইস্যু নয় মোটেই। ভেলকুন-কাহিনির রসিক পাঠক মজে থাকেন এর রসালো ন্যারেটিভে, ভেলকুনের তীক্ষ্ম মধুর রসবোধে আর মানবিক অনুভবে— যা প্রয়োজনে মার্জার-নখরের মতো অতর্কিতে ধারালো হতে পারে, আর তাঁর তিন চ্যালার সুস্বাদু চাপান-উতোরপূর্ণ কিন্তু নিবিড় বন্ধুত্বের বর্ণনায়। 'কী বলা হচ্ছে' তার চেয়েও 'কীভাবে বলা হচ্ছে' উপভোগ করেন যেসব পাঠক, তাঁদের কাছে ভেলকুনমামার কাহিনি অধিক প্রিয় হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

তিনটি ছোটো গল্পের পর ভেলকুনমামাকে নিয়ে প্রথম দীর্ঘ কাহিনি তথা উপন্যাসটি লিখেছিলাম ২০১৪ সালে, পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায়। সেখানেই প্রথম উদ্ভট-আবিষ্কারক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সত্যান্বেষণ-ক্ষমতাটিও পাঠকের সামনে আসে। যদিও পরবর্তীকালে ভেলকুনমামা তাঁর গায়ে গোয়েন্দা-ছাপ লেগে যাওয়ার ব্যাপারটিতে তীব্র অপছন্দ ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, তাঁর আবিষ্কারগুলিকে কাজে লাগিয়ে এক-আধজন মানুষকে অধঃপতন বা বিপদের হাত থেকে বাঁচানোই তাঁর মানবিক উদ্দেশ্য ছিল— তথাকথিত 'পাতি' ডিটেকটিভ হতে তাঁর বয়েই গেছে!

১

গানের ওপারে

সাতসকালে ভেলকুনমামার বৈঠকখানায় হিন্দি সিনেমার গান বাজছে, ব্যাপারটা কী! 'লেনা হোগা জনম হমে কয়ি কয়ি বার...'

দরজার সামনে, রকে চটি ছাড়তে ছাড়তে পল্টু বলল, "কিশোরকুমার! আহা আহা, গুরুদেব!... ফুলোঁ কি রঙ্ সে, দিল কি কলম সে..."

প্রথম লাইনটা ধরে নিয়ে গুনগুনিয়ে উঠেছে পল্টু। সে হিন্দি গানের পোকা।

এখন তবে আমাকে একটু অ্যাকাডেমিক ফান্ডা দেখাতেই হয়, না হলে ফার্স্ট বয় শতদল বসুর মান থাকে না। গম্ভীর গলায় বললাম, "মিউজিক ডিরেক্টর কে? বলতে পারবি?"

"কে আবার, আর ডি বর্মন!" পল্টুর উত্তর একেবারে ঠোঁটের ডগায়।

টিকলুর পায়ে স্ট্র্যাপ-আঁটা চপ্পল, ঝুঁকে পড়ে সেটা খুলছিল। সেই ঝোঁকা অবস্থাতেই হাসল। বলল, "রিয়েলি,

কনফিডেন্সের সঙ্গে ভুল উত্তর দেওয়া একটা আর্ট, আর পল্টু একজন সত্যিকারের আর্টিস্ট! সিখে কোই, ইনসে সিখে!"

সম্প্রতি একসঙ্গে বসে টিভি-তে 'থ্রি ইডিয়টস' দেখার পর থেকেই, কাউকে হ্যাটা করার অমোঘ অস্ত্র হিসেবে এই শেষের হিন্দি সংলাপটা উপযুক্ত মুহূর্তে প্রয়োগ করে থাকে টিকলু। অন্তত পল্টুর ক্ষেত্রে, ফলটিও হয় একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র-পাশুপতের মতো!

চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠে পল্টু দাঁত খিঁচোল, "তুই সেই আদ্যিযুগের প্যানপেনে নাকিসুরের বাংলা গান ছাড়া কী জানিস! তোর সাউন্ড-সিস্টেমে হিন্দি গান তো বাজতে শুনিইনি জীবনে..."

"স্বীকার করি। কিন্তু, এই হিন্দি গানটার সুরকার কে, সেটা শুধু বাংলা গানের ইনফো জানলেই বলে দেওয়া যায়, চাঁদু।" টিকলু সোজা হয়ে দাঁড়াল, "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন!"

আমি বললাম, "হুঁ, ঠিক কিন্তু! সিক্সটি-নাইনের পুজোয় রিলিজ্‌ড একটা বাংলা বেসিক গান; তার সুরেই হিন্দি গানটা তৈরি হয়েছিল, পরের বছর। অবিকল এক সুর বসিয়ে, সিনেমায় কিশোরকুমারকে দিয়ে গাইয়েছিলেন ওই একই সুরকার।"

"আর ডি বর্মন নয়?" পল্টুর ভুরুতে ভাঁজ।

"আজ্ঞে না! ডি বর্মন পর্যন্ত মিলেছে, কিন্তু আর নয়। এস। আর-এর পিতাঠাকুর। গানটা ছিল 'বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে' এটসেট্রা। বোঝা গেল?"

"ওহ্ হো! শচীন দেববর্মন!" জিভ কেটে হেসে ফেলেছে পল্টু, "একচুলের জন্যে মিস!"

টিকলু ফের টিপ্পনী ছাড়ে, "হ্যাঁ, একচুলই বটে, তবে কিনা ব্রবডিংনাগের চুল! ইয়া মোটা! হি হি!"

"দেখ ফের যদি..." বলে রুখে উঠতে যাচ্ছিল পল্টু, এমন সময় বৈঠকখানার ভেতর থেকে গবেষকপ্রবরের জলদমন্দ্র কণ্ঠ ভেসে এল, "কই হে, তোমরা কি যাবতীয় সাংগীতিক আলোচনা রকে দাঁড়িয়েই সমাপ্ত করে ফেলতে চাইছ?"

বিবাদ মুলতুবি রেখে তিনমূর্তি ঢুকলাম বৈঠকখানায়। একটা বেতের চেয়ারে আয়েশ করে বসেছেন ভেলকুনমামা, চক্ষু নিমীলিত, মুখে পরম প্রশান্তি। পাশের টেবিলে রাখা একটা মিনি সাউন্ড বক্স, তাতে একটা পেনড্রাইভ গোঁজা, গানটা সেই বক্সেই বাজছে। আর মামার হাতের আঙুলগুলো চেয়ারের হাতলে টরেটক্কা বাজাচ্ছে গানের তালে।

ভেলকুনমামা ধুরন্ধর প্রতিভাবান, কিন্তু লোক বড়ো মাই-ডিয়ার। বন্ধুর মতো মেশেন। দেখতে একেবারে ছাপোষা গেরস্তের মতো কিন্তু বুদ্ধিটি অতি ধারালো, যদিও ঠান্ডা মেজাজের আড়ালে সেই ধার চাপা পড়ে থাকে বেশির ভাগ সময়েই। যখন মোক্ষম প্রয়োজন, তখন ঝলসে ওঠে বুদ্ধি-ব্যক্তিত্ব দুইই। টিকলু বলেছিল একবার, 'আপাত নিরীহ কিন্তু দরকারে প্রখর/ মার্জার-থাবার মধ্যে লুকানো নখর!' শুনে হেভি খুশি হয়েছিলেন মামা। তাঁর নিজেরও চমৎকার

রসবোধ। বিশেষত, যখন কোনো নতুন গবেষণায় সফল হন আর আমাদের সে-খবরটি জানাবেন বলে ডেকে পাঠান, তখনকার মুডটি হয় দেখার মতো। কফি-পকোড়া সহযোগে 'ভেলকুনের নয়া ভেলকি' প্রত্যক্ষ করার পহেলা সুযোগ আমাদের তিনজনেরই। সে ক্রীড়াবিদ রোবটই হোক বা মৃত্যুঞ্জয়ী জাদু-পানীয়, কিংবা মিথ্যে ধরার যন্তর! তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো সব অভাবনীয় ব্যাপারস্যাপার। পল্টুর মতে, আজব-আবিষ্কারক হিসেবে ভেলকুনমামার নোবেল প্রাইজ প্রাপ্য!

কিন্তু, ওইখানেই মুশকিল। তাঁর অভাবনীয় 'ইনভেনশন'গুলো আদৌ একশো ভাগ সত্যি, না তাতে পঞ্চাশ ভাগ গুল মেশানো থাকে, সে-মীমাংসায় আমরা এতদিনেও পৌঁছোতে পারিনি। কখনও সন্দেহ হয় নিছক

ফেনানো গল্প, কখনও আবার এমন বোকা বনে যাই, মনে হয়— নাহ্, কিছু তো আছেই! বিশেষত, তাঁর নিজের মুখে নিজের আবিষ্কারের সাতসতেরো শোনার অভিজ্ঞতা, সে এক বাঁধিয়ে রাখার মতো জিনিস। এমন টেকনিক্যাল-থিয়োরিটিক্যাল ডিটেইলিং দিয়ে বোঝাবেন! যাকে বলে 'উইলিং সাসপেনশন অব ডিসবিলিফ', অবিশ্বাস করতে চেয়েও বিশ্বাস করে ফেলা— সেই ফাঁদে পড়ে যাবে শ্রোতা।

আমি যে তাঁর এইসব কীর্তিকলাপ নিয়ে গপ্পো লিখে থাকি, মামা তা জানেন। পাঠকেরা তাঁর কাহিনি পড়তে চায়, এ নিয়ে তাঁর চাপা একটা গর্বও আছে। প্রকাশ করেন না। শুধু একবার, সেই অমৃত-এপিসোডের পর বলেছিলেন, "শতদল, তুমি আবার এগুলোকে কল্পবিজ্ঞান বলে বাজারে ছাড়ছ না তো?"

"ফা-গো-ল!" আমি কায়দা করে জবাব দিয়েছিলাম, "মার খেয়ে মরি আর কী! সবাই জানে, এগুলো সব পিয়োর ভেলকু-বিজ্ঞান!"

কয়েনেজটা খুশি করেছিল মামাকে। মানুষটা ট্যালেন্টেড, কিন্তু মূলত আমুদে আর নাটকপ্রিয়।

আজ এই যে জরুরি তলব, আর বৈঠকখানায় বসে মেজাজে হিন্দি গান শুনতে থাকা— এটিও যে ভেলকুনমামার একটা যবনিকা-উত্তোলনের নাটুকে কৌশল, এ-ও আর বলে দিতে হবে না। এসব ছক আমাদের চেনা হয়ে গেছে। আঁচে একটু হাওয়া দিতে হবে শুধু এখন। তারপরেই গনগনিয়ে উঠবে নতুন আবিষ্কারের সপ্তকাণ্ড-বৃত্তান্ত!

চোখ না-খুলেই মামা তর্জনী তুলে সোফা দেখিয়ে দিলেন। মাথা এখনও নড়ছে গানের তালে। বললেন, "বোসো। মংলু দেখে নিয়েছে তোমাদের। কফি আগতপ্রায়।"

"হঠাৎ হিন্দি সিনেমার গান শুনছেন, কী ব্যাপার?" জুত করে বসে আমি জিজ্ঞেস করি, "আপনার তো একদা ওয়েস্টার্নে মতি ছিল..."

"কারণ আছে নিশ্চয়ই, মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ।" ভেলকুনমামার চোখ এখনও বন্ধই, কিন্তু ঠোঁটে রহস্যময় হাসি, "আপাতত এই গানটার বৈশিষ্ট্য কিছু বলতে পারবে? এনি স্পেশালিটি?"

"বৈশিষ্ট্য? মানে... এ তো কিশোরকুমারের বিখ্যাত গান, দেব আনন্দের মুভি ছিল... নাইনটিন-সেভেনটিতে..."

"উঁহু! ওসব নয়।" ভেলকুনমামা বললেন, "পল্টুকুমার,

এনি গেস?"

পল্টু সদ্য-আহরিত জ্ঞানটাকেই একটু ঘ্যামের সঙ্গে পেশ করতে গেল, "এস ডি বর্মন..."

"ওহ্, না হে, না! হিস্ট্রি জানতে চাইনি। নো পাস্ট, অনলি প্রেজেন্ট! এই যে গানটা এখন বাজছে তোমাদের সামনে, স্রেফ এইটা নিয়ে— এনি স্পেশাল অবজার্ভেশন?"

টিকলুর ভুরুটা ক্রমশ কুঁচকে উঠছিল কেন, এতক্ষণ বুঝিনি। হঠাৎ দেখি, সে আঙুল উঁচিয়ে বলে উঠল, "আরে! এ গানটার সঙ্গে শুধু গিটার বাজছে যে, স্রেফ একটা গিটারের টিংটিং! আর কিচ্ছু অ্যাকম্প্যানিমেন্ট নেই! হিন্দি সিনেমার অরিজিনাল গানটাতে নিশ্চয়ই এইটুকু বাজনা ছিল না! তার মানে দাঁড়াচ্ছে, এটা মূল সাউন্ডট্র্যাক নয়..."

একই সঙ্গে ভেলকুনমামার চোখ দুটো পটাস করে খুলে গেল, আর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টুকুস করে মিউজিক বক্সটা বন্ধ করে দিলেন।

"ব্রাভো!"

টিকলুর মুখে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি। সে ফের বলল, "এটা, তার মানে, কিশোরকুমারের কোনো লাইভ প্রোগ্রাম থেকে নেওয়া! ঘরোয়া ফাংশন বা স্টেজ..."

ভেলকুনমামার মুখে আস্তে আস্তে একটা রহস্যময় হেঁয়ালি-হাসি ক্রমশ ক্ষীণ থেকে চওড়া, আরও চওড়া হতে লাগল। মাথাটা কিন্তু দু-পাশে নাড়ছেন।

টিকলুর ভুরুতে আবার ভাঁজ, "না? লাইভ প্রোগ্রাম নয় বলছেন? অরিজিনালও নয়... তাহলে?"

"শতদল বলো দেখি!" আমার দিকে ফিরলেন মামা।

"উম্‌ম্‌," আমি একটু অন্য সম্ভাবনা হাতড়াই, "এটা... তাহলে... কিশোরের নিজের ভয়েস নয়। কোনো কণ্ঠী-গায়কের গলা, যারা নকল করে গায়..."

"নো স্যার! নো কপি-সিঙ্গার স্যাং দিস ওয়ান, এইটুকু বললাম।"

পল্টু ভেলকুনমামাকে সমর্থন করে খুব বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ল, "কারেক্ট! কিশোরের কপি-সিঙ্গার হিসেবে যাঁরা সবচেয়ে বিখ্যাত, আমি তাঁদের সক্কলের গলা আলাদা করে চিনি। এত একশো ভাগ নিখুঁত ভয়েস বা থ্রোয়িং তাঁরা কেউ আনতে পারেন না, কিছু ফারাক থাকেই। এখানে গলাটা আসলই, সন্দেহ নেই। কিন্তু... অরিজিনাল ট্র্যাক নয়, আবার লাইভ প্রোগ্রামও নয়... এই ব্যাপারটা কীভাবে..."

ভেলকুনমামা চেয়ারে আরেকটু এলিয়ে বসে মিটিমিটি হাসেন। বরাবরই আমাদের এমন পাজ্‌লের মুখে ফেলতে ভারী সুখ হয় তাঁর। পল্টুকে আরেকটু উসকে দিয়ে তিনি বলেন, "ভাবো পল্টুকুমার। ভাবা প্র্যাকটিস করো। তৃতীয় বিকল্প কিছু মাথায় আসছে কি?"

পল্টুকে ভাবতে উৎসাহ দিলে সে ভাবনাটাকে একদম চাঁদে ড্রপ খাইয়ে বৃহস্পতি থেকে বাউন্স করিয়ে আনে। কয়েক সেকেন্ড ব্রহ্মতালু চুলকে নিয়ে সে সোৎসাহে বলে উঠল, "আচ্ছা, আপনি কি প্ল্যানচেটে কিশোরকুমারকে ডেকে..."

টিকলুর বিষম-খাওয়া, আমার কুলকুলিয়ে হেসে-ওঠা আর

ভেলকুনমামার বিস্ময়-বিস্ফারিত মুখে "অ্যাঁ, বলো কী"— এই তিনরকম প্রতিক্রিয়ার মাঝখানে কফি-পকোড়ার ট্রে নিয়ে মংলু এসে ঢুকল।